Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৯ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই আষাঢ়, ১৪৩০ / 24.06.2023

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

চরিত্র	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে এশিয়ার গণতান্ত্রিক জাগরণ	শ্রী অমলেশ ভট্টাচার্য
অতিমানস	বিনয়
সন্ন্যাসী ভোলানন্দ	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
শেফালিকা	শ্রী রবি গুপ্ত
এসো ভুবনে আবার	স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ
যুদ্ধ চিরন্তন	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

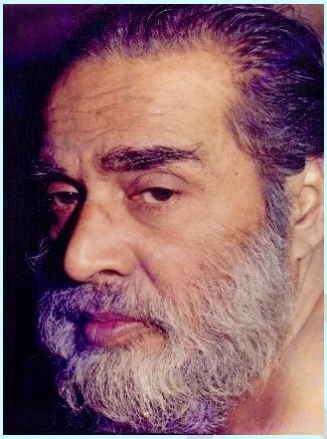

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

চরিত্র **শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ**

ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'চরিত্র' মানুষের জীবনে একটি বিশেষ দিক। চরিত্রের মূল যে গড়ন তা আমাদের জীবনে দেয় অতি সহজে প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব। এই চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রথম ও প্রধান উপাদান হল 'ব্যবহার' -- লৌকিক, সামাজিক, গোষ্ঠী ও নিজ সংসারে।

মানুষের জীবনে অনেক কিছুকে নিয়েই তবে 'চরিত্র'। তুমি যদি ন্যায়নিষ্ঠ হও তাহলে দেখবে তুমি সহজেই ভয়শূন্য হয়েছ। সব ক্ষেত্রেই তুমি মাথা উঁচু করে চলতে পারছ - এটি তোমার স্বাভাবিক বোধে এসে যাবে। মিথ্যাকে আশ্রয় করা বা মিথ্যা বলার মত ঘৃণিত কাজ আর কিছু নাই। এরা সমাজ জীবনে একটি কুৎসিত জীব ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। মিথ্যা বলা এমন ব্যাপার যে তুমি একবার একটা মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাকে ঢাকতে ও সত্যে পরিণত করার জন্য এবং নিজেকে সৎ প্রতিপন্ন করবার জন্য তোমাকে বারবার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে এবং হাজার রকম মিথ্যা বলতে হবে, এবং তোমার নিজের ভিতর

DO NOT COPY

একটি তিক্ত বিরক্ত অবস্থার সৃষ্টি হবে যার জন্য তোমার জীবনের সুখময় অবস্থা বিষময় ভাবে রূপান্তরিত হবে। এর দ্বারা শত্রু বৃদ্ধি হয় এবং সমাজে কলঙ্কিত হতে হয়। লোকের বিশ্বাস হারাতে হয়। বিশ্বাস যদি হারাই তবে সমাজে স্থান কোথায়? সমাজে বড় হতে গেলে সমাজের বিশ্বাসভাজন হতে হবে। অর্থ থাকলে বা সম্পদ থাকলে বা বিদ্যা থাকলেই সমাজের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না।

চরিত্রবলই জগতে শ্রেষ্ঠ বল। ধন বল, জন বল, স্বাস্থ্য, সম্পদ, মান সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সমস্তই চরিত্রবলের উপর নির্ভরশীল। উন্নত পর্য্যায়ের জীবন ধারা ও মনুষ্যত্ব, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ওজস্বিতা মানসিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির মূল উৎসও এই 'চরিত্রবল।' যার চরিত্র আছে তার সব কিছুই আছে; আর যার তা নাই সে সম্পূর্ণ রিক্ত, নিঃস্ব, অসহায়, দুর্বল।

সর্বজনমান্য সর্বজন-শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী গুণী বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষও একমাত্র চরিত্রবত্তার অভাবে অজ্ঞাত অবহেলিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে দুঃসহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

চরিত্রই শক্তির মূল উৎস এবং উন্নতি অভ্যুদয়ের মূল কারণ জানিবে। সততা ও সচ্চরিত্রতার দ্বারা মানুষের জীবনে অমোঘ বীর্য্য ও অক্ষয় ওজঃ সঞ্চারিত হয়, যার বলে মানুষ জয় করতে পারে না এমন কোন কিছু এ জগতে নাই।

ভারতবর্ষে চরিত্রকে সকলের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। চরিত্রবান ব্যক্তি দীন দরিদ্র, অশিক্ষিত, অনুন্নত হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধানগণ তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

(তুমি) মনে রাখবে জগতে কোন শক্তি চরিত্রবান ব্যক্তিকে শাসন করতে সক্ষম হয় না। যে চরিত্রবান - কোনও প্রকার প্রলোভন তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। উপরন্তু কোনও দুঃখ দৈন্য অসুখ অশান্তি পাপ তাপ ভয় ও ভাবনা তার কাছে

DO NOT COPY

আসতে সাহস পায় না। আরও সত্য এই যে রাজা মহারাজা, শক্র, বলবীর্য্য, সম্পদ ও ঐশ্বর্য -- সবই পায়ের তলায় আশ্রয় নেয়। এই যে সুদৃঢ় চরিত্রবল ইহার মূল ভিত্তি হল সংযম ও ব্রহ্মচর্য।

এই যে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ, একে আজ যদি বাঁচতে হয়, তবে সংযম শক্তির প্রভাব বিস্তার করে আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং নীতি ও ধর্মবোধ জাগরণের ভিতর দিয়ে সমাজকে টেনে তুলতে হবে।

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

স্মৃতিচারণের প্রথমে একটা কথা বারবার বলে নিতে হয়। এরকম একটি ধর্মসংক্রান্ত পত্রিকায় ব্যক্তিগত কথার কি প্রয়োজন? কারণটা আর কিছু নয়, এই পত্রিকার যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি তো কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নন, তিনি মা, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্র পরিবৃত এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আমি তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে দেখে এসেছি। আমার কাছে প্রতিদিনের ঘটনাগুলি আমার মত করেই তুলে ধরছি। হয়ত এতে কারো কারো স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ায় আমি তাঁর বিরাগভাজন হচ্ছি। আমরা বাঙ্গালী। কিছু আমরা বলিই, বাসে ট্রামেও আমরা চুপ করে থাকিনা। কাউকে না পেলে আমরা মহাভারতের ভরত রাজা থেকে শুরু করি। তাই আমি আজকাল আর কিছু মনে করি না। শ্রীপ্রীতিকুমার সম্বন্ধে যখন যা মনে পড়ে লিখে ফেলি।

তাঁর জীবনের শেষের দিনগুলির কথাই মনে করি। নিয়মিত শ্যামবাজার যেতে পারতেন না, বেশীরভাগ নিজের ঘরে শুয়ে থাকতেন। বাইরে পায়চারি করতেও বেরোতেন না। তখন কাতার দিয়ে লোক আসতো। এর মধ্যে এক ভদ্রলোক আসতেন যখন তখন। তার চেহারার মধ্যে একটা কি ছিলো যা সহ্য করা যেত না। শুনেছি তিনি ছিলেন সব্যসাচী। ডান হাতে বাঁ হাতে রিভলভার চালাতে

পারতেন। বরানগরের বাড়িতে তাকে কখনও দেখিনি। এখানে কে অমন সাগর ছেঁচা মাণিক এনে দিয়েছিল জানি না। তাকে দেখলে আমার গা সিরসির করে উঠত। প্রথম দিন তাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল মূর্তিমান "কাল" যেন আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছে। শ্রীপ্রীতিকুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাব দেন নি। আমাদের কাউকে তো গ্রাহ্য করতেন না। চিরকালই সবার বড়। সেই "বীরের মত আচরণ" প্রত্যাশা করতেন। কলেজ থেকে সকাল সকাল যদি বাড়ি ফিরতাম, দেখতাম ছেলেটি পায়ের কাছে বসে আছে। কখনও পা টিপতেও দেখতাম। তার আসাটা খুব নিয়মিত হয়ে গেল। শ্রীপ্রীতিকুমারের স্ত্রী হিসাবে আমি সব সইয়ে নিতে চেষ্টা করতাম এবং বড়র মতো আচরণই করতাম। আড়ালে মুণ্ডুপাত করতাম। অনেক কায়দা কানুন করে জানা গেল ছেলেটি একটি খ্যাতনাম্নী স্ত্রী পেয়েছে কিন্তু বাগ মানাতে পারছে না। তাই তার ধর্মে মতি হয়েছে এবং সে শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে যোগশিক্ষা করতে আসতো। বেশ দু-চার মাস তার নিয়মিত আনাগোনা চললো। আমাদের বাড়িতে তখন মহাসমস্যা। পুত্রবধূ (প্রাক্তন) তখন বাপের বাড়ি, বাচ্চা দুটি এখানে। দু তিনটে কাজের লোক এবং যখন তখন লোকের আনাগোনা। শ্রীপ্রীতিকুমার ভীষণ ভাবে নীরব হয়ে গেলেন। যে মানুষ সারাজীবন শুধু আমাকে রান্নার ফরমাশ করেছেন, তিনি প্রায় আহার ত্যাগ করলেন। বুঝিনি, কারণ জানতে চাইনি। নিজেদের সমস্যা নিয়ে বিব্রত বোধ করতে করতে দিন কাটছিল। ছেলেটির আসার কোনও সময় থাকতো না। সেই ২৪শে নভেম্বর (১৯৮৬) কিন্তু সে এলো না। শ্রীপ্রীতিকুমারের মরদেহ শায়িত। বাপী বলল, "মা, ওকে, কিশোরকে খবর দেবে না?" আমি বললাম, "না।" যারা আসেনি, শ্রীপ্রীতিকুমার তাদের আসাটা চান নি, এটাই আমি ধরে নিয়েছিলাম।

যাইহোক, ছেলেটি তারপরও মাঝে মাঝে আসতে লাগলো। এরমধ্যে আমাদের কোর্ট-কাছারি, থানা-পুলিশ নিয়ে হৈ হৈ। বাপী খুব দরকারে সেই ছেলেটিকে আসবার জন্য খবর দিল। ছেলেটি এলো না। তার নাকি সময় হচ্ছে না। আমাদের চরম দুর্দিনেও সে এলো না। কয়েকদিন পর থেকে দেখি ছেলেটি আবার

DO NOT COPY

আসা শুরু করেছে, আর, ঘাপটি মেরে বসে থেকে আমাদের Court case-এর খবরগুলি সব শোনে। আমি কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলাম। একদিন তাকে বললাম, "তুমি যাঁর কাছে আসতে তিনি যখন নেই তোমার আর এখানে আসার দরকার নেই। এখানে যাঁরা family friend তাঁরাই আসেন। তুমিতো তা নও। তুমি শেষের কয়েকদিন মাত্র এসেছ। তাই আমার মনে হয় না তোমার আর এখানে আসবার প্রয়োজন আছে।"

ছেলেটি আসা বন্ধ করলো মাত্র কয়েকদিনের জন্য। হঠাৎ একদিন আবার এসে হাজির। বাপীকে আলাদা ডেকে বললো সে আসনে বসতে পারছে না, concentrate করতে পারছে না। সে কি করবে? বাপীর কাছে খুব কাঁদতে লাগলো। আমি straight বললাম, আমি তো যোগের কিছু জানি না। তাছাড়া আমি এখানে একা থাকি। এখানে কারও এভাবে আসাটা আমি ভালোভাবে নিচ্ছিনা, আমি চাইছি না আমাদের এই সমস্যার মধ্যে আর কেউ এসে পড়ে। ছেলেটি পার্থসারথির postal registration-এর ব্যাপারে শ্রীপ্রীতিকুমারের কিছু কাজ করে দিয়েছিল। পদ্ধতিটা তার জানা ছিল, কিন্তু আমরা তখন ছিলাম অজ্ঞ। তাই বাপী তাকে অনুরোধ করেছিল ঐ কাজটি করে দেবার জন্য। হচ্ছে না, অনেক অসুবিধে ইত্যাদি ইত্যাদি .....। সুতরাং আমি সিদ্ধান্তে এসে গেলাম নতুন করে আর আত্মীয়তা করবার আমার দরকার নেই। তখন নীরেন দা, কিশোর পাগলের মত কোর্ট কাছারিতে ছুটোছুটি করছেন। ঐ দুঃসময়ে আমরা পাগলের মত হয়ে গেছিলাম। আমাদের পরমাত্মীয়েরা কেউ কেউ আসেন, পা নাচিয়ে গল্প শুনে চলে যান। দু-একটা মন্তব্য করেন, চা জলখাবার খান, চলে যান। আমি দেখে যাচ্ছি ..... দেখে যাচ্ছি ..... শুধু দেখে যাচ্ছি।

ছেলেটি এ বাড়িতে আসবার অনেক রাস্তা খুঁজলো। কিন্তু তার এই অতিরিক্ত আগ্রহ আমাকে আরও জেদী করে তুললো। কারণ সকলের জন্য দরজা খোলা রাখবার মত energy আমার ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ আমার তাকে কেমন "মহাকাল"

DO NOT COPY

বলে মনে হয়েছিলো যে আসবার কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীপ্রীতিকুমারকে চলে যেতে হয়েছিলো। হয়তো আমার কুসংস্কার! তারপর প্রায় একবছর গেলো। গেলো। ছেলেটি মাঝে মাঝে knock করে দেখে। আমার ঐ এক কথা – এ বাড়িতে আসা চলবে না। বাসে একদিন দেখা হল। আমার কাছে এগিয়ে এলো। Normally কথাবার্তা বললাম। পার্থসারথির চাঁদা আমাকে দিলো। দুঃখ প্রকাশ করলো স্ত্রীর সাথে বনিবনা নেই, স্ত্রী ওকে গ্রাহ্য করেনা। বাপের বাড়ি চলে গেছিলো। নিজের ছেলেকে দেখতে পেতো না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার শোনাই সার। আমার পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব নয়। যিনি শুনে কিছু করতে পারতেন, তিনি দেহ রেখে মুক্তি পেয়েছেন। ..... এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ ছেলেটি একদিন এখানে হাজির। তখন আমার কনিষ্ঠ এক "পরমাত্মীয়" পায়ের উপর পা দিয়ে বিভিন্ন serious বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। ঘটনাটা তাঁর উপস্থিতিতেই ঘটলো। ছেলেটিকে আমি বললাম, "তুমি আবার কেন এলে?" উত্তর দিল, "আপনার সাথে দেখা হয়েছিলো, Salt Lake-এ বাপীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তাই এলাম।" আমি বললাম, আমি তো তোমাকে আসতে বলিনি। এ বাড়িতে হুট করে কেউ এসে গেলে আমার অসুবিধে হয়। আমার সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার দায় এখন আমার। এটা আমাকে maintain করতেই হবে। তুমি আর আসবে না। ছেলেটি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গজগজ করতে লাগলো। মনে হল তার বাড়ি থেকে তাকে চলে যেতে বলা হচ্ছে। তীরের বেগে বেরিয়ে গেলো। আমার ঐ আত্মীয় বললেন, "ওকে প্রথমে বসতে বলা উচিৎ ছিল। এক কাপ চা offer করা উচিৎ ছিল। তারপর নিষেধ করা যেত।" তাকে বললাম, "চা offer করার অর্থই তাকে receive করা। বসতে বলা মানেই তাকে স্বীকার করে নেওয়া। তাহলে আরও পেয়ে বসবে।" মনে মনে বললাম, "তোমার আর কি? ঘা তো তোমার হয়নি! বড়ভাইদের ছায়ায় থেকে সংসার কর, দায়িত্ব কোনদিন নিতে হয় নি। তুমিতো বসে বসে suggestions দিতেই পারো। তোমারই স্ত্রীর আত্মীয়া একজন অভিজ্ঞ advocate; তার নামটা আমাদের কাছে বলোনি। যখন একজন ভালো lawyer

DO NOT COPY

এর জন্য আমরা অসহায়ের মত ছুটোছুটি করে মরছি, আমার বন্ধুরা কিছু ঠিক করতে পারছিলো না, তুমি চুপ করে থেকেছিলে, তোমার ঘরের কথা অন্যে জানবে কেনো এইজন্য! অথচ আমি চুরি করিনি, অন্যায় করিনি, ধর্মপথে ছিলাম। প্রতাপ তো আমার থাকবেই। অমন স্বামীর যে ঘর করে তার একটু অহংকার থাকেই।" যাইহোক, সামনাসামনি কটুকথা শ্বশুরকূলের কাউকে কখনও বলিনি। সেদিনও বললাম না।

আমার ধাতে মাখন মাখানোটা একেবারেই নেই। তাই স্পষ্ট কথা বলে ফেলি। দিন কাটছে .....। গত রবিবার সেই ছেলেটি আবার এসে হাজির। পার্থসারথির চাঁদা দিতে এসেছে। আমি refuge করলাম। পার্থসারথি পত্রিকা নিয়ে আমি ব্যবসা করিনা। ওটা এখন আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির ফলশ্রুতি। কোনও গ্রাহক না থাকলেও একটি copy ছাপাবো, যতদিন বাঁচবো। নতুন করে ঐ পত্রিকার মাধ্যমে খাল কেটে কুমীর ঢোকাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। তাই .....

আমার এসব কথা লেখবার উদ্দেশ্য শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে মাঝে মাঝে কি ধরণের material উপস্থিত হত এবং এই দীর্ঘ তিন বছর আট মাস কি ধরণের collection নিয়ে আমি কালাতিপাত করছি এটা জানানো। এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা এসে পড়ে এবং এইসব সমাহারে আমার মেজাজটি ঠিক কোথায় রাখা উচিৎ সেটা পাঠকবর্গই বিচার করবেন। .....

– – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল - আগস্ট, ১৯৯০)

DO NOT COPY

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে এশিয়ার গণতান্ত্রিক জাগরণ

শ্রী অমলেশ ভট্টাচার্য

সারা বিশ্বের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে তার সার্থকতা বিচার করে শ্রীঅরবিন্দ দেশের স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা কোন রকম সংকীর্ণ দেশগত বা দলগত স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তার কর্ম ঐতিহাসিক, দৃষ্টি আন্তর্জাতিক, সঙ্কল্প সার্বভৌম।

অতি শৈশবে শ্রীঅরবিন্দের যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তর-জীবনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল, তিনি অনুভব করেছিলেন জগৎ জুড়ে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে, এবং সেখানে তাঁর রয়েছে একটা বিশেষ ভূমিকা। পরবর্তীকালে বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিতে তিনি দেখলেন, যে বিরাট আন্দোলন ঘনঘটা করে এসেছে - সে আন্দোলন হল এশিয়ার নবজাগরণ - "that movement is the resurgence of Asia" - এবং সেই নবজাগ্রত এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র হল ভারতবর্ষ - "India is the keystone of the Arch."

শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন প্রাচীন এশিয়ার যে সনাতন সভ্যতা তা বর্তমানে দুই ভিন্নমুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটি মঙ্গোলীয় সভ্যতার ধারা এশিয়ার দক্ষিণ দিকে, আর একটি পরাক্রমী যুদ্ধমুখী মুসলমান সভ্যতা এশিয়ার বাম দিকে মিশর, আরব, পারস্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এশিয়ার সভ্যতার এই দুই ধারা এসে মিলিত হয়েছে ভারতবর্ষে -- একটা সমন্বয়ের একটা সম্মিলনের জন্য। ভারতের এই মিলনভূমিতে এই দুই বিরোধী জীবনধারার মিলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে এশিয়ার ভবিষ্যতের এক সাধারণ সভ্যতা - "In India the two civilizations meet, she is the link between them and must find the note of harmony which will reconcile them and recreate a common Asiatic civilization." এশিয়ার যত কিছু মূল ভাব মূল ধর্ম সে-সবের

DO NOT COPY

যত রকম বৈচিত্র্য তার সবগুলিই উৎসমুখ হতে প্রবাহিত হয়ে ভারতের জাতীয় জীবনের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শি, খৃষ্টান, শক, হূণ, মোঘল, পাঠান - আর এই সমস্তকে এক করে পূর্ণ করে গড়ে তুলবে তার জাতীয়তা। ভারতের এই জাতীয়তা, শ্রীঅরবিন্দ বললেন, প্রকৃত অর্থে বৃহত্তর এশিয়ার জাতীয়তা, ভারতের এই জাতীয়তার জাগরণ ও মুক্তি হল এশিয়ার জাগরণ ও মুক্তি। তিনি আরও বললেন, সনাতন ভারতের প্রতিভা শুধু কর্মে নয়, বরং গভীর এক অধ্যাত্ম দর্শন তার ধ্যান তার সংকল্প কর্মের মধ্যে সার্থক করে তোলা। আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি দিয়ে বাইরের ব্যবহারিক জীবনের সব কিছুকে অভিষিক্ত করে ধরা। তাই ভারতবর্ষ কাজ করে বাইরের বিচার দিয়ে নয়, অন্তরের নির্দেশ দিয়ে, বাইরের জীবনকে কর্মকে সে ধরে রাখে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে। তাই ভারতীয় সভ্যতার শক্তি এত অপরিমেয়, হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতবর্ষ পৃথিবীর জন্য তার সভ্যতার এই কালজয়ী শক্তির রহস্যকে ধরে রয়েছে, পৃথিবীকে নতুন করে গঠন করবে বলে। ইতিহাসে যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তার এক একটি ছটা সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, সৃষ্টি করেছে সভ্যতার পর সভ্যতা।

তাই, ভারত না জাগলে এশিয়া জাগবে না। আর এশিয়ার নবজাগরণ না হলে পৃথিবীরও মুক্তি হবে না। তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "... It is left for Asia, especially for India to reconstruct the world." সকল ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের জন্ম এই ভারতবর্ষে - "the ancient cradle of religion, science and philosophy," -- জগতের সভ্যতার পথে চিরকাল আলো ধরে এসেছে এই এশিয়া - "the spiritual light she alone can turn upon the world."

যদি ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে কি দেখি? দেখি, ভারতের কালজয়ী প্রাণশক্তি; এক বিপুল জীবন-প্রবাহ, তার আশ্চর্য সৃজন-প্রতিভা। গত তিন হাজার বছর কি তারও বহুকাল আগে থেকে সমানে গড়ে তুলেছে কত সাম্রাজ্য, কত দর্শন, কত বিজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব, মতাদর্শ, শিল্পকলা, কাব্য-সাহিত্য, মঠ-মন্দির।

DO NOT COPY

স্থাপন করেছে কত ধর্ম, কত শাসনবিধি, কত সমাজবিধি, রাষ্ট্রতন্ত্র, সাধনতন্ত্র, শিল্প-বাণিজ্য। অফুরন্ত তার কর্ম, তার সৃষ্টি।

ভারতের পতাকা নিয়ে পণ্যভরা ভারতীয় বাণিজ্য তরী পাড়ি দিয়েছে সাত-সমুদ্দুর, দেশ দেশান্তর। তার ধনসম্পদ ছড়িয়ে পড়েছে জুডিয়া, মিশর ও রোম পর্যন্ত। ভারতের সংস্কৃতির চিহ্ন আজও দেখা যায় মেসোপটেমিয়ার মরুভূমির বুকে, ভারতের ধর্ম দিগ্বিজয় করেছে চীন, জাপান হয়ে পশ্চিমে প্যালেস্টাইন ও আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত। ভারতের বুদ্ধের বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনেছি খৃষ্টের কণ্ঠে।

শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র ইউরোপের জীবন-ইতিহাস আলোচনা করে দেখালেন, ইউরোপের মানুষ তার বাইরের বাস্তব-জীবন, তার খাওয়া-পরা, সুখ-সুবিধার সমস্যার চরম উন্নতি করেছে বিজ্ঞানের সাহায্যে। কিন্তু বাইরের প্রাচুর্য দিয়ে অন্তরের শূন্যতাকে সে ভরাতে পারেনি। ইংল্যাণ্ড তার ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়ে, ফ্রান্স তার পরিচ্ছন্ন বিচার ক্ষমতা দিয়ে, জার্মানী তার পরিকল্পনা-প্রয়াসী মন দিয়ে, রাশিয়া তার প্রাণাবেগের শক্তি দিয়ে, আমেরিকা তার ব্যবসায়িক তৎপরতা দিয়ে যতটা সম্ভব করেছে, কিন্তু তবু জীবনের সমস্যা মিটল না, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে - “Something is wanting which Europe can not supply.”

জীবনের এই যে “একটা কিছু চাই” - “something wanting” - এর সন্ধান দিতে পারে একমাত্র এশিয়া। জগৎ আজ এশিয়ার কাছে আশ্রয়প্রার্থী। শ্রীঅরবিন্দের কথায় - “The world needed her.” পৃথিবীর জীবনে শান্তির অমৃত বাণী শোনাবে এই এশিয়া - “Asia is the custodian of the world’s peace of mind, the physician of the maladies which Europe generates.”

DO NOT COPY

এশিয়ার শক্তি হল সমন্বয়ের শক্তি, সম্মিলনের শক্তি। “The strength of Asia is in synthesis.” শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার আন্দোলন হল এশিয়ার এই আত্মশক্তির উদ্বোধন। “Awakening of Asia is a fact of the twentieth century.” -- তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমাদের এই সংগ্রাম কেবল দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রাম দুনিয়ার সকল মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির সংগ্রাম। “We fight not only for our own political and spiritual freedom but for the spiritual emancipation of the human race.”

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, এশিয়া কখনও ইউরোপ নয়। সে কোনদিন ইউরোপীয়ান হবে না। যারা মনে করে এশিয়ার রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রেরণা ইউরোপ থেকে আসবে তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিদেশীর মন্তব্য বিদেশী সংবাদপত্রের কটাক্ষ উল্লেখ করে তিনি বললেন, তারা মনে করে এশিয়ার লোক জংলী, অসভ্য, বর্বর, তাদের কোন শিক্ষা দীক্ষা নেই, রাজনৈতিক চেতনা নেই। এই সব “funny Asiatic”-কে সভ্য ও সুশিক্ষিত করে তোলার দায় ইউরোপের সাদা চামড়ার মানুষদের। ভগবান যেন এশিয়ার মানুষদের সৃষ্টি করেছেন কেবল সাহেবদের বুটের লাথি আর অত্যাচার সহ্য করার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পৃথিবীর ইতিহাস অন্য কথা বলে।

ইউরোপ গর্ব করে তার গণতন্ত্রের (ডেমোক্রেসির) আদর্শ নিয়ে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, শ্রীঅরবিন্দ বললেন, এশিয়ার মানুষই পৃথিবীকে প্রথম গণতন্ত্র শিখিয়েছে - “Asia is the cradle and home of Democracy.”

এশিয়ার তপস্যা জগৎকে বলেছে , মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। মানুষ ভগবানের অংশ। আপনার সত্যে সে ভগবান। মানুষ যখন তার সেই অন্তরাত্মার সত্যে স্বাধীন ও স্বরাট হয়ে ওঠে, জীবনের আর সকল স্বাধীনতাই তখন তার করায়ত্ত। একে অন্যের থেকে পৃথক, একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থের সংঘর্ষ এটা হল

মিথ্যা দৃষ্টি। পৃথিবীর সভ্যতার যে ইতিহাস তারও বহু আগে থেকে জগতের মানুষকে এশিয়া দিয়েছে তার এই জ্ঞানের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে সে জগৎকে, জগতের সকল মানুষকে দেখেছে নিজেরই সত্তার অংশ বলে, গ্রহণ করেছে নিজের ভাই বলে; সমাজকে রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে সেই প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে। এশিয়ার মানুষ অপরকে সেবা করে পেয়েছে চরম সুখ, সর্বস্ব ত্যাগের মধ্যে পেয়েছে পরম সম্পদ। শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেছেন ভারতের 'বেদান্ত সমাজ' - "Society of the Vedantic ideal," - এই হল এশিয়ার গণতন্ত্র - "Asian Democracy"- আবার এই হল এশিয়ার ধর্ম, তার রাজধর্ম, সমাজ ধর্ম। "This perception transfuses itself into the law of government and society,"- গণতন্ত্রই তার ধর্ম, এশিয়ার বিপ্লব তাই তার ধর্মবিপ্লব। এরই মধ্যে এশিয়ার রহস্য, এশিয়ার আত্মা।

এই সব মহৎ ভাবের মধ্যে এশিয়া যখন জাগ্রত, সারা ইউরোপের তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। কোনও সভ্যতার আলো তখনও তার কাছে পৌঁছায়নি।

এইভাবে ধর্মের বাণী জীবনের বাণী হয়ে এশিয়া থেকে গণতন্ত্রের আদর্শ গেল ইউরোপে - "Democracy has travelled from the East to the West." প্রাচ্যের বেদান্ত ধর্ম মধ্য প্রাচ্যের খ্রীষ্টধর্মের মধ্য দিয়ে ইউরোপ প্রথম পেল মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ। "Christianity was an assertion of human equality in spirit" - যদিও খ্রীষ্টধর্ম এশিয়ার মত তার সমাজ ও রাষ্ট্রধর্মকে বদলাতে চায়নি, সে চেয়েছিল কেবল ইউরোপের মানুষের মনে একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বোধ জাগাতে। কিন্তু ইউরোপ তখন আর্যসভ্যতার প্রতিভূ যে গ্রিস ও রোম, তার প্রভাব থেকে প্রায় সম্পূর্ণ সরে গিয়ে জার্মান জাতির সামরিক সভ্যতার প্রভাবে পড়ে গিয়েছিল। তাই খৃষ্টের বাণী এক বিকৃত কদর্থে পরিণত হল উৎকট সামরিক হিংসার কবলে। এশিয়া থেকে খৃষ্টধর্ম অপসৃত হল।

DO NOT COPY

তখন জাগল ইসলাম ধর্ম। এশিয়ার গণতন্ত্রের আর এক নতুন রূপ। জীবনের যে যেখানে আছে, সমাজের ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী সব মানুষ এক। সকলেরই সমান অধিকার -- "All men are brothers in Islam." ইসলাম এসে তার এই আদর্শকে সবলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। কিন্তু তার এই উদার একত্ব ও সমত্বের আদর্শকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখল একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর যে সকল জাতি এবং উপজাতি এই আদর্শকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে চাইল তারা ছিল প্রায় দুর্ধর্ষ ও অনুন্নত। ফলে ইসলামের মূল বাণী থেকে তারা ক্রমশঃ দূরে সরে গেল। আজ তাই ইসলামের মধ্যে তার অন্তরের বাণীকে নতুন করে উদ্বোধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে - "Another revealation of the old truth is needed."

গণতন্ত্রের পথে বারবার যে বাধা এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে প্রধান যে বাধা, শ্রীঅরবিন্দ বললেন, তা হল মধ্যযুগের সামন্ত্রতন্ত্র- "Feudalism." কেননা মানুষে মানুষে ভেদ ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে অসাম্য সৃষ্টি করেছে এই সামন্ত প্রথা - "Feudalism wedded to in-equality and the pride of caste."

যে ধর্ম ছিল গণতন্ত্রের প্রাণ-মন্দাকিনী, তা যেমন ভারতে তেমনি ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের কবলে বিকৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ভারতে এবং ইউরোপে সমানে চলতে লাগল। শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাস আলোচনা করে বললেন, ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় সাধুসন্ত সুফীদের অনলস সাধনায় চলল ধর্মকে মানবধর্মে পরিণত করার চেষ্টা।

ইউরোপে মাজিনি (Mazzini) খৃষ্টধর্মের মূল বাণীকে পাশ্চাত্যের সমাজভাবনার মধ্যে নতুন করে রূপ দিতে চাইলেন। আর ফরাসী বিপ্লবের ভিতর দিয়েই ইউরোপে বাস্তবিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত হল। ইউরোপের এই নবদীক্ষিত গণতন্ত্রই ভারতবর্ষে এল সমাজচিন্তার আদর্শ হিসাবে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন,

DO NOT COPY

গণতন্ত্রের পীঠস্থান যে এশিয়া সেখানেই এবার হবে ইউরোপের থেকে আমদানী করা এই নয়া-গণতন্ত্রের শুদ্ধি ও শোধন। তার কাজ হবে মানুষে মানুষে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তার অন্তরতম সত্যের সন্ধান দেওয়া - "Her mission is to point back humanity to the true source of human liberty, human equality, human brotherhood." মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষক আর শোষিতের, বঞ্চক আর বঞ্চিতের নয়। সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে অন্তরাত্মার মিলনে, সেবায়, কর্মে, ত্যাগে, আনন্দে, সুখে, সখ্যে। "... by mutual love and service, not by shakles of servitude or the relations of the exploiter and the exploited and the eater and the eaten."

ইউরোপের জল হাওয়ায় পুষ্ট আমাদের দেশের আজকের যে নয়া-গণতন্ত্র, শ্রীঅরবিন্দ পরিষ্কার বলেছেন, সে এক অসুস্থ গণতন্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে নানা বিকার। সেই সব বিকার ও দুর্বলতা সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যর্থতা নিয়ে আসছে। গোটা সমাজকেই অসুস্থ করে তুলছে। শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেছেন, "modern malady of Europe." শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ইউরোপ তার গণতন্ত্রের মধ্যে মানুষের অধিকারকে নিয়েছে কিন্তু মানবধর্মকে নেয়নি। তাই সে এনেছে মানুষে মানুষে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কেবল স্বার্থ আর ক্ষমতার লড়াই, প্রত্যেকের নিজের নিজের অধিকারের সংগ্রাম। একদিকে সমাজের নীচুতলার নিরন্ন নিঃসম্বলের মধ্যে এনে দিয়েছে স্বার্থ ও সুযোগ আদায়ের প্রলোভন আর সমাজের উপরতলার মানুষদের দম্ভ আর ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাই ক্রমেই উৎকট হয়ে উঠেছে হিংসা, বিদ্বেষ আর পারস্পরিক হানাহানি - "It took as its motive the rights of man and not the dharma of humanity, it appealed to the selfishness of the lower classes against the pride of upper; it made hatred and internecine war ....।" ইউরোপের এই অসুস্থ জীবন ও সমাজের চিকিৎসার ভার আজ এশিয়ার উপর। কেননা এশিয়া হল সারা ইউরোপের "custodian" এবং "physician," - ইউরোপের এই বিভ্রান্ত গণতন্ত্রকে এশিয়া

DO NOT COPY

তার নিজের জীবন-সাধনা দিয়ে শোধন করবে, তাকে সমাজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সার্থক ভাবে রূপায়িত করে তুলবে। এই হল বিশ্ব-ইতিহাসে এশিয়ার নবজাগ্রত সভ্যতার ভূমিকা।

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
** (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে)

অতিমানস **বিনয়**

জড়ের মাঝে যেদিন প্রাণ সঞ্চার হলো সেদিন প্রকৃতির একটা বিরাট পরিবর্ত্তন বলতে হবে। সেই প্রাণ ধর্মী যারা তারাই প্রাণী। তারপর মনের বিকাশ। মনোময় জীবই মানুষ। দেহ প্রাণ মন নিয়েই মানুষের দৈনন্দিন কারবার চলেছে। এর ঊর্ধ্বের খবর মানুষ অল্পই রাখে।

সাধনার বলে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে এই মনের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে পৃথিবীর বুকে এর স্থায়ী ফল এখনও আসেনি। এই মনের ঠিক উপরের স্তর উচ্চতর মন (Higher mind), তার উপর প্রবুদ্ধ মন (Illumined mind), তারও ঊর্ধে প্রজ্ঞামন (Intative mind), শেষ পর্য্যায় অধিমন (Over mind)

অধিমানস বিদ্যা অবিদ্যাময়ী শক্তি। উহার একদিকে জ্ঞানের দ্যুতি, অন্যদিকে অজ্ঞানের কর্ম প্রেরণা। একদিকে সেই ‘একমেবাদ্বিতীয়ম’ এর সঙ্গে যোগ, অন্যদিকে বহুকে নিয়ে তার কর্মধারা, এত ভগবানের বিচিত্র সম্ভাবনাকে পৃথক পৃথক ভাবে রূপায়িত করা, বিভিন্ন তত্ত্ব অবলম্বন করে বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করা, আবার সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জগতকে নিয়ে নিজের ব্যাপক চেতনার মধ্যে সংহত করে

DO NOT COPY

রাখা অধিমানসের কাজ। জড়লোক, প্রাণলোক, মনোলোক অধিমানসের সৃষ্টি। অধিমানস চেতনার শক্তিবাদী নিজধামে যে শক্তির অধিকারী মনোলোক প্রাণলোক জড়লোকে নেমে সে সামর্থ্য বজায় রাখতে পারে না।

এই মাটির পৃথিবীতে ভাগবত জীবন রচনা করতে হলে, এই মানবকে অতিমানবে রূপান্তর সাধন করতে হলে ঊর্ধ্ব হতে এমন শক্তিকে নামিয়ে এনে মানুষের জীবনে কার্য্যকরী করা দরকার যা সর্বজয়ী, অপ্রতিহত, জ্ঞানজ্যোতি বিমণ্ডিত।

এই সর্বজয়ী অব্যাহত জ্ঞান শক্তির আকর অতিমানস (Supermind) বিশুদ্ধ বিদ্যাময়ী শক্তি, অখণ্ড চেতনার ভূমি। এই অতিমানস শক্তি অজ্ঞানের অন্ধকারে নেমে এসে অপ্রতিহত বেগে কাজ করতে পারে। মানুষের জীবনকে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিব্যভাবে রূপায়িত করতে পারে। অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে এনে আমাদের জীবনে সক্রিয় করাই আমাদের একমাত্র ব্রত।

সিদ্ধি ও মুক্তি এক কথা নয়। মুক্তি - নিম্ন প্রকৃতির দুর্নিবার অসত্য আকর্ষণ ছিন্ন করে সত্যলোকে উঠে দাঁড়ান; অবিদ্যার অন্ধকারময় আবরণ ভেদ করে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় লোকে উঠে দাঁড়ান; অজ্ঞান প্রসূত সর্ববিধ কর্মফল নিঃশেষে ক্ষয় করে মৃত্যু হতে অমৃতলোকে উঠে দাঁড়ান।

প্রয়াণের দুই যুগ পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ অধিমানস সিদ্ধিলাভ করেন। অধিমানস শক্তি তাঁর দৈহিক স্তরে নেমে এসে সমস্ত আধারটি দিব্যজ্যোতি ও আনন্দের প্লাবনে পরিপ্লুত করে দেয়। তখন হতে তাঁর জীবনে শুরু হয় অতিমানস সিদ্ধির পথে বিজয় অভিযান। মানুষের অতিমানস রূপান্তরের ফলে পৃথিবীতে সম্ভব হবে অতিমানব জাতির জন্ম। পূর্ব পূর্ব যুগে যে সব অবতার ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা ঊর্ধ্ব চেতনায় দাঁড়িয়ে লোক হিতার্থে কাজ করে গেছেন বা পরামুক্তির পথে কিংবা

DO NOT COPY

নির্বাণের পথে চিরপ্রয়াণ করেছেন। দেহ প্রাণ মনকে দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত করার দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেন নাই। সেজন্য পার্থিব চেতনার কোন রূপান্তর সাধিত হয় নাই। অবতার মহাপুরুষের প্রভাবে কিছুদিন পর্য্যন্ত সেই সব উচ্চভাব এই জগতে সক্রিয় থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তার অবসান ঘটে।

অতিমানস শক্তি বলে পার্থিব সত্তার সর্বাঙ্গীন রূপান্তর সাধিত না হলে পৃথিবীতে স্থায়ী ভাগবত জীবন রচনার আশা করা বৃথা। তাই শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য অতিমানস সিদ্ধি। স্থূল দেহটির পর্য্যন্ত রূপান্তরের দ্বারা দিব্যজীবন, অমৃত লাভ।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস রূপান্তরের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করার সময় আজ এসেছে। তাঁর সাধনা বিশ্ব প্রকৃতির বিবর্তন ধারার পথে এক অভিনব যুগ পরিবর্তনের সাধনা। শ্রীঅরবিন্দের বাণী ভারতের অধ্যাত্ম পুরুষের বাণী। তাঁর সাধনা সেই অমৃতের সাধনা যার সহায়ে সমস্ত জগতে স্থায়ী শান্তি ও মঙ্গল সদা বিরাজমান থাকবে।

অতিমানস বিজ্ঞানের অবতরণ ও অগ্রগতি যে অনিবার্য তা শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায় – “I know with absolute certitude that the supramental is a truth and that its advent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and the how. That also is decided and predestined from some where above. This is however certain that number of souls have been sent to see that it shall be now. That is the situation. My Faith and Will are for the now.” (28.12.1934. Letters of Sri Aurobindo - Second series Page 67-68.)

এ সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন – “It is not for personal greatness that I am seeking to bring down the supermind. I care nothing

DO NOT COPY

for greatness or littleness in the human sense. I am seeking to bring some principles of inner Truth, Light, Hermony, Peace into the earth-Consciousness; I see it above and know what it is- I feel it ever gleaming down on my consciousness from above and I am seeking to make it possible for it to take up the whole being into its own native power, instead of the nature of man continuing to remain in half-light, half darkness. I believe the descent of this Truth opening the way to a development of divine consciousness here to be the final sense of the earth evolution. If greater men than myself have not had this vision and this ideal before them that is no reason why I should not follow my Truth-sense and Truth-vision. If human reason regards me as a fool for trying to do what Krishna did not try, I do not in the least care. There is no question of X or Y or anybody else in that. It is question between the Divine and myself - wheather it is the Divine Will or not, wheather I am sent to bring that down or open the way for its descent or at least make it more possible or not. Let all men jeer at me if they will or all still fall upon me if it will for my presumption, - I go on till I conquere or perish. This is the spirit in which I seek the supermind, not hunting for greatness for myself or others." (10.02.1935, Letters of Sri Aurobindo Second series Page 73-74).

শ্রীঅরবিন্দের এই seeking আজ আর স্বপ্ন নয়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারীতে অবধারিত ভাবেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

DO NOT COPY

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার। এখানে কুলুকুলু নিনাদে গঙ্গা বয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে। এর পবিত্র কোলে সুন্দর একটি আশ্রম আছে। স্থানটির নাম লালতারা বাগ। এই আশ্রমটি 'ভোলাগিরি আশ্রম' নামে খ্যাত।

স্বামী ভোলানন্দ 'ভোলাগিরি' নামেই বেশী পরিচিত। এঁর আসল নাম ভোলানাথ। পাঞ্জাবের এক প্রান্তে ছিল এনার বাসস্থান।

অল্প বয়সেই মা-ভাই প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ইনি সংসার ত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরতে ঘুরতে এলেন কুরুক্ষেত্রের কাছে কর্ণবল জেলার ডাকখানা কওয়ালের অধীন একটি গ্রামে। গ্রামটির নাম পন্থানা। এখানে বাস করতেন শ্রীমৎ স্বামী গোলাপগিরিজী মহারাজ। এনার আশ্রয়ে কিছুদিন এনার সেবায় দিন কাটান। পরে গোলাপগিরি ভোলানাথকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেন। নাম হলো ভোলানন্দ গিরি। ভোলানন্দ গুরুকে শিবজ্ঞানে পুজো করেন। তাঁর ইষ্টমূর্তি ছিল মহেশ্বর।

প্রায় এগারো বছর কেটে গেল গুরুর কাছে আছেন ভোলানন্দ। গুরু গোলাপগিরি একদিন ভোলানন্দকে ডেকে বললেন, 'ভোলা, তুই প্রায় বারো বছর হতে চললো সংসার ত্যাগ করেছিস। একবার জন্মভূমি দর্শন এবং মাকে প্রণাম করে চলে আয়। দেখিস্, মাকে যেন আত্মপরিচয় দিস্ নি।'

গুরুর উপদেশ পালন করলেন ভোলানন্দ। মায়ের সঙ্গে ছদ্মবেশে দেখা করে ফিরে এলেন গুরুর কাছে।

এরপর এক বছর কেটে গেল। একদিন গোলাপগিরি বললেন ভোলানন্দকে, 'ভোলা, তুই আমার অনেক সেবা করেছিস। তোর ব্যবহারে ও ভক্তিতে আমি বস্তুতই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তুই এখন অন্যত্র গিয়ে কঠোর সাধনায় রত হ'। আমি তোকে

বর দিচ্ছি তোর যোগ ও ভোগ উভয়ই লাভ হবে।'

পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে ভোলানন্দ চললেন হিমালয়ের দিকে। গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র পর্যটন করেছেন ভোলানন্দ। এবার একান্ত বাসনা দ্বারকাতীর্থ পরিদর্শন করবেন।

সেইজন্যে বোম্বাই শহরে এসে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করলেন। ঘুরতে ঘুরতে একজন শেঠের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। শেঠপত্নী তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হন। তাঁর একটি বিবাহ যোগ্যা কন্যা ছিল। তার সঙ্গে এই সন্ন্যাসী কুমারের বিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উপরন্তু তাঁর সঞ্চিত পনেরো লক্ষ টাকাও ছিল।

স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে পত্নী ভোলানন্দকে বললেন, বাবা, এই বয়সে কেন এত কষ্ট করছো? যৌবনটা ভোগের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ ও ধর্ম করবে। ভোলানন্দ তাই শুনে বললেন, মা, আমি মাধুকরী করতে এসেছি। আপনাদের ইচ্ছে থাকে তো আপনি আমাকে কিছু দিন। তা নাহলে আমি চলে যাই।

বৃদ্ধা তখন ভোলানন্দর প্রতি আরও আদর যত্ন দেখাতে লাগলেন। বললেন, আমার ১৫ লক্ষ টাকা আছে। আর আছে আমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে। তুমি ঐ মেয়েকে বিয়ে করে প্রচুর অর্থের অধিকারী হও। আমাদের আর বিষয় সম্পত্তি ভালো লাগছে না। এবার বানপ্রস্থ অবলম্বন করবো।

ভোলানন্দ তাই শুনে বললেন, মা, আপনাদের যখন টাকাকড়ি ভাল লাগে না তখন আমাকে তা ভোগ করতে বলছেন কেন? ওসব ভোগ করলে আমি কি প্রকৃত শান্তি পাবো? বৃদ্ধা তখন মনে মনে ভোলানন্দর তত্ত্বমূলক কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন। তারপর তার নিজের বাসনা ত্যাগ করে ভোলানন্দর ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখে মুগ্ধ হন।

DO NOT COPY

ভোলানন্দ যথারীতি মাধুকরী সেরে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। মনে মনে গুরুকে আর ইষ্টদেবকে প্রণাম জানালেন, প্রভু, আজ আমাকে একি কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আপনাদের অশেষ কৃপায় আমি সে পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি।

হরিদ্বারে এসেছেন ভোলানন্দ গিরি। এখানে গঙ্গার ধারে মোহান্ত স্বামী শিবদয়াল গিরি মহারাজের বাগান বাড়ীতে বাস করবার ইচ্ছা করলেন। বাবাজী রাজী হয়ে গেলেন। ঐ আশ্রমই কালে ভোলানন্দ গিরির সন্ন্যাস আশ্রম নামে পরিচিত হয়।

ভোলানন্দ ওখানে থেকে দৈনিক সাধন ভজন করতে লাগলেন। রাত তিনটের সময় উঠে নিকটবর্তী একটা পাহাড়ে যেতেন। গৌরীকুণ্ডর কাছেই সে পাহাড়টা। সেখানে একটা গুহার মধ্যে ধ্যান জপ করে কাটাতেন ভোলানন্দ। রাত তিনটে থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত ঐ গুহায় ধ্যান করতেন ভোলানন্দ।

আর একদিন ভোলানন্দকে স্বপ্ন দিলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। তিনি বললেন, বাবা ভোলা, আমার লিঙ্গমূর্তি আশ্রমের বাগানে পোঁতা আছে। তুমি ওটিকে উদ্ধার করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করো। ভোলানন্দ সেই আদেশমত কাজ করলেন। শিবলিঙ্গ উদ্ধার করে সুন্দর ও সুদৃশ্য মন্দির প্রস্তুত করালেন। এখন সেখানে মহা আড়ম্বরে শিবের পুজো হয়।

কোলকাতায় এসেছেন ভোলানন্দ। এখানে সামান্য বেশভূষায় শরীর আবৃত করে অবস্থান করছেন। এমন সময় এক সাহেব তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন। সাহেবটি ভোলানন্দকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে ইচ্ছা করলেন। ভোলানন্দ বললেন, আমি অর্থ চাই না। সাহেব খুব সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

এবার কয়েকজন বাঙ্গালীবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা ভোলানন্দকে বললেন, আমরা আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।

ভোলানন্দ বললেন, 'দীক্ষা নিয়ে কি হবে? নিয়ম তো পালন করতে পারবে না। তোমরা বাঙ্গালী, মাছ মাংস না খেয়ে পারবে না। আমার কাছে দীক্ষিত হলে ওটি ছাড়তে হবে। তা তোমাদের দ্বারা হবে না। সুতরাং দীক্ষার দরকার নেই। যাও, কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও। সেইমত সাধন-ভজন করো গে। সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিলে অনেক শক্ত নিয়ম পালন করতে হয়। তা তোমরা পারবে না।'

কিন্তু ভক্তরা যে সহজে তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁরা তদ্ গতচিত্ত। বললেন ভোলানন্দকে বিনয় নম্র ভাষায়, 'কি কি নিয়ম পালন করতে হবে বলুন। আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করব যাতে আমাদের দ্বারা নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়।'

ভোলানন্দ বললেন, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ আহার ত্যাগ করতে হবে। পর দার গমন করতে পারবে না। মিথ্যাকে বিষের মত ত্যাগ করতে হবে। কাউকে গাল দিতে পারবে না। পরনিন্দা ও শঠতা করতে পারবে না। কোন রকম মাদকদ্রব্য সেবন করতে পারবে না। জুয়াখেলা ও ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। এছাড়া আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দানার্থে ব্যয় করতে হবে। প্রতিদিন ঊষায় ও সায়ংকালে দেড় ঘণ্টা করে পরমেশ্বরের ভজনে ব্যয় করতে হবে। প্রতিদিন সাধুসঙ্গ, তার অভাবে সদ্গ্রন্থ পাঠ বা সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করতে হবে। পিতামাতার চরণে প্রতিদিন সকালে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁদের চরণামৃত পান করতে হবে। পিতামাতা জীবিত না থাকলে তাঁদের ধ্যান করে মনে মনে প্রণাম করতে হবে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। কুগ্রন্থ পাঠ করা চলবে না। অন্ততঃ এগুলি যদি করতে পার তাহলে আমার কাছে এসো। এখন যাও, এই নিয়মগুলি পালন কর, ভবিষ্যতে দীক্ষা মিলবে।'

পরে ভোলানন্দের শিক্ষা ও উপদেশ অনুসরণ ও অনুশীলন করে বাংলাদেশের বহু লোক তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হয়ে উঠলো। সারা বাংলাদেশে ভোলানন্দর নাম ছড়িয়ে পড়লো। এদেশে তিনি 'ভোলাগিরি' নামে প্রসিদ্ধ হন।

DO NOT COPY

একদিন হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের কাছে বসে আছেন স্বামী ভোলানন্দ। চট্টগ্রাম থেকে নবদ্বীপ চন্দ্র রায় এলেন ভোলানন্দকে দেখতে।

অন্তর্যামী ভোলানন্দ ব্রহ্মকুণ্ডের জল স্পর্শ করার সময় বললেন, 'তোমাদের কারও কারও ইচ্ছা, আমি বসে একটু আলাপ করি।' নবদ্বীপচন্দ্র এবং আরও অনেক ভক্ত সেই কথা শুনে আনন্দিত হলেন। আলাপ শুরু হলো। ভক্তরা নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজীকে। স্বামীজী তার প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দিলেন। তারপর স্বামীজী নবদ্বীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, তীর্থে এসেছ, তীর্থকে কিছু দিতে হয়। তুমি কি দেবে? এই কথা বলতে বলতেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করলেন স্বামীজী। ব্যস্, তখুনি সমাধিস্থ হলেন।

নবদ্বীপ স্বামীজীর সেই রূপ দেখে এমনই মোহিত হন যে স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে স্বামীজিকে একটি পত্র লেখেন,-

'বাবা! ... তখন আপনি গঙ্গাতীরে সান্ধ্যসমীরে উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যেই সুশোভিত হয়ে আমার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করেছিলেন। অহো! সে দর্শন বুঝি অনেকের ভাগ্যেই ঘটে নি। আপনাকে সেদিন যে রূপের ভেতর দেখেছি, আবার দেখলে যদি সেরূপ দেখতে না পাই সেই ভয়ে আপনাকে পুনরায় দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। যে অমৃতময়ী বাণী সেদিন আপনার মুখ থেকে বেরিয়েছিল তেমন বাণীও বোধ হয় আর শুনবো না।' সত্যিই সেদিন অমৃতভরা বাণী শুনেছিলেন নবদ্বীপচন্দ্র। মনে হয় ভোলানন্দর ইষ্ট দেবতা স্বয়ং শঙ্কর এসে ভোলানন্দর মধ্যে প্রকট হয়েছিলেন।

দিল্লীতে হাইকোর্টের উকিল পণ্ডিত শ্যামলালের বাড়ীতে রয়েছেন ভোলানন্দ। কৈলাস দাস নামে একজন বাঙ্গালী শিষ্য তাঁর সঙ্গে ছিল। একদিন পথে যেতে যেতে ভোলানন্দ দেখলেন, কতকগুলি লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছন পেছন চলেছে ক্রন্দনাকুল পিতা। পুত্র মৃত। তাই পিতার বড় শোক হয়েছে। ভোলানন্দ ঐ দৃশ্য দেখে কৌতুক হাসি হেসে কৈলাসকে বললেন, দেখ

DO NOT COPY

কৈলাস, ঐ ছেলেটি কিন্তু মরে নি। অথচ লোকেরা ওকে মৃত ভেবে শ্মশানে নিয়ে চলেছে।

কৈলাস বললে, সে কি স্বামীজী? ভোলানন্দ বললেন, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। দেখবি? এই বলে তিনি কৈলাসের সঙ্গে শ্মশানে এলেন। শোকসন্তপ্ত পিতাকে ও অন্যান্য লোকদের সরে যেতে আদেশ করলেন। ওরা সরে গেল। পরে ভোলানন্দ মৃত সন্তানটির কাছে এলেন। নিজের কমণ্ডলু থেকে কয়েকবার জল নিয়ে ছেলেটির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ছেলেটি চোখ চাইল। পাশ ফিরে শুলো। ছেলের বাবাকে তখন ভোলানন্দ বললেন, ওকে তুমি পোড়াতে এনেছিলে। অথচ ও জীবিত রয়েছে। পিতা তখন স্বামিজীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ছেলেটির হাত ধরলো।

স্বামীজী বললেন, ওর হাত ছাড়ুন। ও আমার ছেলে, আপনার নয়। এরপর দু'এক কথা হলো স্বামিজীর সঙ্গে উপস্থিত ভক্ত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের। স্বামীজী চকিতে ছেলেটিকে কোলপাঁজা করে ওর মায়ের কাছে এনে বললেন, 'জীবিত ছেলেকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে তার জন্যে কাঁদছিস কেন? এইনে তোর ছেলে।' এই কথা বলেই পনেরো বছরের একমাত্র ছেলেটিকে মায়ের কোলে শুইয়ে দিলেন। শোকসন্তপ্তা জননী এই দৃশ্য দেখে তো অবাক। প্রথমটা ভয় পেলো। ভাবলে একি কোন ভৌতিক ব্যাপার নাকি! সে জানে তার ছেলে মারা গেছে।

পরে স্বামীজী তার ভুল ভেঙ্গে দিলেন। জননী এবার উৎফুল্ল হৃদয়ে স্বামিজীর চরণে লুটিয়ে পড়লো।

আসামের সিলেট জেলা। সেখানে সুনামগঞ্জে বাস করতেন রায় বাহাদুর অমরনাথ রায়। তিনি ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য। তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলো। ডাক্তার বদ্যিরা জবাব দিয়ে গেছেন, ছেলে আর বাঁচবে না।

পিতা তখন নিরুপায় হয়ে অগতির গতি ভোলানন্দকে টেলিগ্রাম করলেন। ভোলানন্দ তখন হরিদ্বারে রয়েছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,

‘যথাশক্তি নাম ও দান করো।’ অমর রায় সেইমত ক্রিয়া করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ছেলেটি ঘুমের ঘোরে দেখলো, ভোলানন্দ সশিষ্য তাঁর কাছে এসেছেন। কমণ্ডলু হাতে জল নিয়ে ছেলেটিকে খাইয়ে দিচ্ছেন। অমনি তার ব্যাধি ভাল হয়ে গেল।

পরদিন ছেলেটি তার গর্ভধারিনীকে ডেকে বললে, মা, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। মা বললেন, ‘সে কি বাবা!’ ছেলেটি বললে, ‘না মা! স্বামীজী এসেছিলেন। আমার আর কোন কষ্ট নেই।’ মা বললেন, ‘কি রে, কি হয়েছে বল্ না, স্বামিজীকে কিভাবে দেখলি?’ ছেলেটি বললে, ‘খুব উজ্জ্বল মূর্তি। মাথায় পাগড়ী। পায়ে খড়ম ও হাতে কমণ্ডলু। পেছনে একদল সন্ন্যাসী। স্বামীজী তাঁর হাতের কমণ্ডলু থেকে আমার সর্বশরীরে জল ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হলো।’

অমর রায় তখন ছেলের কথামত তার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে অনুভব করলেন, ব্যাধি সেরে গেছে। তিনি স্বামিজীকে সবকিছু জানিয়ে পত্র লিখলেন। সেই পত্রটি ভোলানন্দ জনৈক শিষ্যকে পড়তে দিলেন। শিষ্য পড়তে লাগলেন। ভোলানন্দ এক মনে শুনে গেলেন।

পড়া শেষ হলে শিষ্যটিকে বললেন, ‘দেখ্, তোরা তো বিশ্বাস করিস না যে, চৈতন্য সর্বব্যাপী। এই দেখ্, আমি তো এখানেই তোদের কাছে রয়েছি। আমি তো সুনামগঞ্জে যাই নি। কিন্তু চৈতন্য সর্বত্রই রয়েছেন। তিনি সেখানে বসেই কাজ করেছেন। এই চৈতন্যকে সাধনবলে জানতে শেখ। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হতে পারবি।’

একবার সিলেটের হবিগঞ্জ নিবাসিনী জনৈকা স্ত্রী ভক্ত ভোলানন্দর ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে তিনি ভোলানন্দের মূর্তির জায়গায় নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন। এই সব দেখে তিনি পত্র মারফৎ হরিদ্বারে ভোলানন্দকে জানালেন-
শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,

বাবা! এসব দেখে আমার মনে হয়, তুমিই সর্ব জীবে আছ। তুমিই আমার দেহে আছ। তুমিই ত পরব্রহ্ম স্বরূপ আত্মা। আত্মা তো সর্বজীবেই অবস্থিত। তা

আসলে বোঝাবার জন্যেই নানাভাবে দেখা দিচ্ছ। তুমি যে শুধু তোমার দেহ মূর্তিতে বিরাজমান এটা আমার ভুল ধারণা। বাবা, এসব কি, আমাকে বুঝিয়ে দাও। বাবা! মন স্থির হলে মাঝে মাঝে নানা রকম শ্লোক শুনতে পাই। আমি বুঝিও না, মনেও রাখতে পারি না। কোন কোনদিন ঘুমের ঘোরে গুরুগীতা পাঠ করতে থাকি। গান করি, আবার আমার কানেই সে সব বেশ শুনতে পাই। এসব কি ভুল? বাবা! তোমার পুজোয় বসলে কাঁদতেই ভাল লাগে। পুজো কি করবো, পুজো তো জানিনা। কার পুজো করবো? তুমি তো অন্তরের ধন। অন্তরেই রয়েছ। অন্তরের ধনকে কি দিয়ে পুজো করবো? পাতা ফুল দিয়ে তোমার পুজো করা বিড়ম্বনা মাত্র। বাবা! কবে প্রাণভরে অন্তরের সঙ্গে তোমার পুজো করতে পারবো? কবে এই দেহ মন তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করতে পারব? বাবা! মিথ্যে মায়ায় আর ভুলিয়ে রেখো না।'

চিঠি পড়ে ভোলানন্দ উত্তর দিলেন, 'তোমরা আমার নারায়ণ। আশীর্বাদ জানবে। যা কিছু শুনছো সব সত্যি। যা কিছু দেখছ সবই তোমার ইষ্টদেব-পরমেশ্বর।'

এমনিভাবে কতবার কত মানুষের উপর ভোলানন্দর কৃপা পড়েছে। বিভিন্ন প্রকারের মানুষ বিভিন্নভাবে স্বামিজীর কাছ থেকে উপকার পেয়ে ধন্য হয়েছে।

"কারো কারো যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিৎ। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে, - হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে, - আবার সেই যোগের অবস্থা।"

----- শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত

DO NOT COPY

শেফালিকা **শ্রী রবি গুপ্ত**

রজনী শেষের অগণিত তারা বুঝি বা তখনো জাগে
নিষ্প্রভ দীপ রাগে,
পাণ্ডুর চাঁদ সুদূর গগনে দূরতম কোন পথে
চলিছে বিদায়-রথে।
ধূলিজাত শ্বেত-শিখা
মৌন-ছন্দে জাগি তরুশাখে সেই ক্ষণে শেফালিকা।
পাবক-অভীপ্সার চলি পথ – একান্ত এক আশা
বুঝি পায় তারি ভাষা;
তোলে বিলসিয়া মোর সত্তার প্রতি অণু-পরমাণু
অনন্তিকার ভানু।
প্রশুভ্র প্রসূনিকা
পৃথিবীর পথে ধূলি অঙ্গনে ধরি দূর-দীপালিকা।

এসো ভুবনে আবার **স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ**

এসো ধরায় ব্রজেশ্বর এসো নিয়ে অবতার
বংশীবাদক নয় নিয়ে এসো চক্রের ঝঙ্কার।।
মোহনরূপে নয় বীরবেশে অত্যাচারী ধরায়
করিতে অধর্ম বিনাশ চাই তোমার সহায়
অগ্নিদৃষ্টিতে বর্বর করিতে সংহার।।
নয়কো প্রেমের গান, ছুঁড়িতে ধ্বংসের বাণ
কলির অসুর নাশে এসো ভগবান।
চাইনা বংশীধারী, চাই গদা-ধনুর্ধারী
কৃষ্ণ নয় রুদ্রনামে হয়ে চক্রধারী
ধর্মস্থাপনায় তোমা' করি আহ্বান।

DO NOT COPY

যুদ্ধ চিরন্তন **সুনন্দন ঘোষ**

রোসারিও থেকে হাজার মাইল দূরে
হিগেরার জঙ্গলে হত্যা করা হয়েছিল এর্নেস্তো চে গেভারাকে।
মাষ্টারদা সূর্য সেনের নিহত শরীরকে চট্টগ্রামের কারাগারে
ঝোলানো হয়েছিল ফাঁসির দড়িতে।
স্বাধীন দেশে ফাইলের স্তূপে চাপা দেওয়া হল
নেতাজী সুভাষকে।

প্রহর বদলায়, রণভূমি বদলায়, যোদ্ধা বদলায়,
শাসকদের রূপ বদলায়, স্বরূপ বদলায় না!
বানতলা থেকে হাঁসখালি, বিজন সেতু থেকে বগটুই .....
রক্তের ছিটে লাগে সাদা পাঞ্জাবীতে,
সাদা শাড়িতে, চটিতে।
বুদ্ধিজীবি ভৃত্যেরা কাপড়ের দাগ মুছতে থাকে।
সময়ের সাথে সাথে সে দাগ
ছড়িয়ে যায় ইতিহাস বইয়ের পাতায় পাতায়।

গলায় ফাঁসির দাগ নিয়েই ক্ষুদিরামদের পুনর্জন্ম হয়।

DO NOT COPY